



মহলানবিশ-এর প্রেসিডেন্সি থেকে পেনসিলভানিয়ার রাও বিষয় থেকে বিষয়ের বাইরে

তথাগত দাশগুপ্ত

আমার কোনোদিন বিষয়ের কেন্দ্রে থাকা হলোনা। ক্লাসে থাকলে মন চিরকালই বাইরে থাকত, পাঠ্যবই হাতে নিলে বাইরের বইই মনে পড়ত বেশি, এখনো নির্মম সিরিয়স কর্পোরেট মিটিং চলাকালীন আমার মন কলেজ স্ট্রিট থেকে শান্তিনিকেতন, মোংজার্টের সলজবার্গ থেকে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম আর কুষ্টিয়ায় লালন ফকিরের মাজারে মুহূর্তের মধ্যে ভেসে যায়। পড়তে এসেছিলাম একটা নামকরা কলেজে রাশিবিজ্ঞান বিষয় নিয়ে, তিরিশ বছরেরও আগে, কিন্তু সেই কলেজ থেকে নিয়ে বেরিয়েছিলাম বিষয়ের বাইরের নানা অভিজ্ঞতা। সাতাশ বছর আগে দেশ ছাড়ার সময় আমার প্রিয় শিক্ষক, বিভাগীয় প্রধান ডঃ অতীন্দ্রমোহন গুণ বললেন, ‘দেশে তো পড়াশোনা কিছুই করলে না, বিদেশে গিয়ে পড়াশোনা করবে?’

প্রেসিডেন্সি কলেজের রাশিবিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পদার্থবিদ্যার পণ্ডিত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, যাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। সাহিত্যজগত আর বিজ্ঞানের জগৎ সেযুগে ততটা আলাদা হয়ে যায়নি, বরং দেখা যায় সে-যুগের শ্রেষ্ঠ ছাত্ররা ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিদ্যা এইসব বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন। প্রেসিডেন্সির এক বাংলার অধ্যাপকের সন্তান হিসেবে মহলানবিশের উত্তরাধিকার বিষয়ে আমার জানা ছিল, তাই উচ্চমাধ্যমিকের পর বাবার কাছে গিয়ে তুলনামূলক সাহিত্য পড়বার অনুমতি চাইলে (আটের দশকেও অনুমতি চাওয়ার ব্যাপারটা ছিল, মাত্র তিরিশ বছর আগের কথা) তিনি যখন বললেন, আজকাল সাহিত্য পড়ে তো আর তেমন কাজ পাওয়া যায় না, তোমার তো অঙ্কে ব্যুৎপত্তি রয়েছে, তুমি অর্থনীতি বা মহলানবিশের প্রতিষ্ঠা করে যাওয়া রাশিবিজ্ঞান বিভাগে পড়বার কথা ভাবতে পারো, সেটা তখন আশ্চর্য মনে হয়নি। বাবার নিজের ছিল উল্টো ব্যাপার, তাঁর ইন্টারমিডিয়েট ছিল বিজ্ঞানে, বেশ ভালোই রেজাল্ট করেছিলেন, কিন্তু কলেজে পড়বার সময় বাংলা বেছে নিয়েছিলেন – প্যাশন এমন ব্যাপার। বিজ্ঞান আর সাহিত্য – এই দুই জগতের মধ্যে, মনে হয়, আগে অনেক চলাচল ছিল। আমাদের সময়ে গিয়ে দেখি জগত

ভাগ হয়ে গেছে – সহপাঠীদের মধ্যে বিষয়ের বাইরে তত কৌতূহল দেখিনি। (কিছু কিছু ব্যতিক্রম আছে – আমাদের অনেক পরের ব্যাচের জগদ্বিখ্যাত রাশিবিজ্ঞানী ভ্রমর মুখোপাধ্যায় যেমন নাট্যাচার্য অশোক মুখোপাধ্যায়ের কন্যা, সাহিত্যে তার অনুরাগ প্রগাঢ়, এই সংখ্যায় তার একটি ছোট লেখাও আছে)। শিক্ষকদের মধ্যে কিন্তু বহু গুণের সম্মিলন ছিল, এর পরেই বলছি তাঁদের কথা, কিন্তু আমাদের সমকালীনদের মধ্যে ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে ছাত্রদের শিক্ষার তুলনায় পেশাদারিত্বের দিকে ঝোঁক বেশি ছিল।

এর বহু বছর পরে পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভারসিটিতে ডক্টরেট করার সময় রাশিবিজ্ঞানের অধুনাবধি জীবিত কিংবদন্তী কল্যাণপুড়ি রাধাকৃষ্ণ (সি আর) রাওকে দেখি একবার এক অনুষ্ঠানের পর তাঁর বাড়িতে। শিল্পী ভোজনের সময় পরিশীলিত বাংলায় তাঁর স্বভাবজাত শিশুসুলভ কৌতুকে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি, তুমি তো হিন্দুস্তানি রাগসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ‘মাদ্রাজি’ (কর্ণাটকী গায়ন পদ্ধতিকে বাঙালিরা যা বলতেন সেকালে) গানও শোনো দেখছি, এটা কি করে হলো?। সদ্যোপ্রয়াত বালমুরলীকৃষ্ণ ছিলেন পাশে, তিনি বললেন, ‘তুমি আজকের অনুষ্ঠানে দর্শকাসন থেকে আমাকে মায়ামালবগৌলা আর পরমাত্মমুড়ু ভেলিগে গাইতে বললে না? আমিও তাই ওগুলি না গেয়ে আকাশভরা সূর্যতারা শুনিয়ে দিলাম!’ রাও বললেন, ‘মাছ বানাতে পারো? শেষ ভালো মাছ খেয়েছিলাম শ্রীমতী মহলানবিশের বাড়িতে।’ প্রেসিডেন্সির রাশিবিজ্ঞান বিভাগের বিভীষিকাময় যাত্রাশুরুর দৌলতে ছাত্রজীবনের শেষপাতে মিষ্টির ভাগে এই সঙ্গ পেয়ে বড় আনন্দ হয়েছিল। বিষয়ের থেকে বাইরে গিয়ে বিষয়ের দুঃস্বপ্নগুলি ভুলতে পেরেছিলাম।

দুঃস্বপ্ন কেন, বলি। প্রেসিডেন্সি কলেজ বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত যে-সমস্ত কলেজে স্ট্যাটিস্টিক্স (রাশিবিজ্ঞান, বা পরিসংখ্যানতত্ত্ব) পড়ানো হতো, সেখানে গুরুত্ব ছিল নীরস তত্ত্বের ওপর, আংকিক প্রমাণ ও তার নানারকম ঘোরপ্যাঁচ মুখস্ত করতে হতো।

তরুণ শিক্ষক শৈবাল চট্টোপাধ্যায় প্রথমদিন ক্লাসে এসেই বললেন, আমার খাতায় আজও আছে সেই নোট, যে, ‘মুখস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করো।’ ছাত্রদের রেজাল্ট ভালো করার জন্যই তিনি এই সুপারামর্শ দিয়েছিলেন, বেশির ভাগ ছাত্র মেনেও নিয়েছিল তাঁর সেদিনের বেদবাক্য, কিন্তু আমার একেবারে অন্তর থেকে প্রতিবাদ জেগেছিল। শিক্ষকের প্রতি নয়, শৈবালদার মত ছাত্রদরদী সুভদ্র শিক্ষক কমই ছিলেন, কিন্তু পরীক্ষায় ভালো করবার জন্য এই প্র্যাকটিকাল পরামর্শ আমার একেবারেই মনে ধরেনি। যুক্তি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতার ব্যবহার করে যে-শাস্ত্র শিখবো ভেবেছিলাম, সে-শাস্ত্রে বৈদিক চ্যান্টিং দরকার হবে ভেবে শিউরে উঠেছিলাম। দেখলাম, সহপাঠী-সহপাঠিনীরা আমার থেকে অনেক এগিয়ে, একেকটা মন্তু বড় ইকুয়েশনের প্রফ তারা ছবির মতো সংকেত সাজিয়ে চোখ বুজে দেখতে পায়। আমার নিজেকে অন্ধ মনে হল। সংকেতগুলি কী বলছে কিছু বুঝতেই পারছি না, বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে তৈরি একটি শাস্ত্রে এমন অবাস্তব জীবনবিরোধী দম আটকে আসা শ্রম আমার আর দিতে ইচ্ছে করলো না। খুলে দেখলাম পাঠ্যপুস্তক – সেগুলিও গভীর সংকেতে লেখা, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই বিচার নেই, প্রাত্যহিকের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, ভিসুয়াল আর্টের কথা তো বাদ-ই দিলাম, একেবারে ঢোকাই যায়না, এত দুখপাঠ্য বই। লাইব্রেরি থেকে বাইরের যেসব বই পড়তে বলা হতো, সেগুলি অনেক উচ্চস্তরের – পরবর্তীকালে পি এইচ ডি করার সময় সেসব বই দরকার হয়েছে, আন্ডারগ্র্যাজুয়েট স্তরে সেসব বই পড়তে বলার কোনো মানে হয় না।

বাকি রইলো প্রাইভেট টিউশন থেকে শেখা। কলেজের অধ্যাপকরা নিয়মনীতি মেনে কলেজের ছাত্রদের প্রাইভেটে পড়াবেন না, সুস্থির সিদ্ধান্ত। বাইরের কলেজের ছেলেমেয়েদের পড়াবেন অবশ্য। তাহলে আমাকে উলটে বাইরের কলেজের শিক্ষকদের কাছে যেতে হয়। খবর নিয়ে জানলাম বাইরের একজন নামকরা শিক্ষক হচ্ছেন রাহুল মুখার্জি, যাঁর পিতা প্রতীপ মুখোপাধ্যায় সরকারি সার্ভিসে আমার পিতার সহকর্মী ছিলেন। এদিকে আমার বাবা নীতিবাগীশ, তিনি না করেন নিজে কোনোৱকম টিউশনি, না বোঝেন আমার টিউশন নেওয়ার প্রয়োজন। ‘মাস্টারমশাইদের কাছে কমন ক্রমে গিয়ে প্রশ্ন করলেই হয়, সানন্দে বুঝিয়ে দেবেন তাঁরা,’ বলে তিনি আমাকে আশ্বস্ত করেন। একজন সহপাঠী বললো, ‘গিয়ে পয়সা দিয়ে পড়বে কেন ওঁর কাছে? উনি তো নীরবে নোট লিখে যান, কিছু বোঝানোর ব্যাপার নেই, সাংঘাতিক সব নোট, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন সেইসব নোট থেকে আসে, কিন্না সেইসব নোটগুলি মুখস্ত করলে তুমি অনায়াসে পরীক্ষায় ভালো করবে, আমি তোমাকে আমার নোট দিয়ে দেব।’ সহপাঠীর বদান্যতায় আমি মুগ্ধ, কিন্তু আমার জ্ঞানলাভের ইচ্ছা আরো স্তিমিত হয়ে গেল। তাই পরমজ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে আমি ক্যান্টিনের দিকে চললাম।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ক্যান্টিনের বিশ্বে আমি যা শিখেছি, আজ মধ্যবয়সে এসে মনে হয় সেই হলো জীবনের আসল শেখা। প্রধানত তিনটি দিকে আমার বিষয়ের বাইরে শেখার মূলসুত্রগুলি পেয়েছিলাম – সাহিত্যবোধ, রাজনীতিচিন্তা ও সাংস্কৃতিক রুচিবোধ। এর প্রধান কারণ ওইসময়ের

প্রেসিডেন্সি কলেজের ক্যান্টিনের বিশ্বে আমি যা শিখেছি, আজ মধ্যবয়সে এসে মনে হয় সেই হলো জীবনের আসল শেখা। প্রধানত তিনটি দিকে আমার বিষয়ের বাইরে শেখার মূলসুত্রগুলি পেয়েছিলাম – সাহিত্যবোধ, রাজনীতিচিন্তা ও সাংস্কৃতিক রুচিবোধ।

কলেজের অন্যান্য ছাত্ররা, যারা ক্যান্টিনেই থাকতেন। সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দিই।

ক্যান্টিনে প্রথমদিন ঢুকেই দেখি বাঁদিকে বার্গম্যানের রেট্রোস্পেক্টিভের পোস্টার তৈরি করছে অর্থনীতির অভিজিত দা (দত্ত, একে পাটালি বলে ডাকা হত)। সন্তুপণে এগিয়ে গিয়ে বললাম, ‘ফিল্ম ক্লাবের দৌলতে এঁর অনেক নাম শুনেছি, দেখা হয়নি কোনো ছবি। এঁর সম্পর্কে একটু বলবে?’ তখন আমার বয়স আঠারো, অভিজিতদার কুড়ি। শান্ত, গম্ভীর ছেলে। ধীরে ধীরে আমাকে বোঝালো, মানবমন ও হিউম্যান কন্ডিশনের সঙ্গে ঈশ্বরবোধের সম্পর্ক ও দোটানা, আধুনিক অস্তিত্ববাদ ও তার দর্শন নিয়ে বার্গম্যানের প্রশ্ন, সেভেন্থ সীল থেকে ওয়াইল্ড স্ট্রবেরিজ, ক্রায়েজ এন্ড হুইস্পারস এর মূল চিন্তা। আজ অবাক হয়ে ভাবি, ওই বয়সের ছাত্রদের মধ্যে এই গভীর অনুসন্ধিৎসা কি খুব সাধারণ, নাকি প্রেসিডেন্সিতে এসেছিলাম বলে পেয়েছিলাম?

প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই রাজনীতিচিন্তার জগত অধিকার করে নিল ক্যান্টিনের দাদারা। তখন (আটের দশকের মাঝামাঝি) প্রেসিডেন্সি কলেজ এ্যাসোসিয়েশন (পি সি এস এ)-এর সময়, প্রেসিডেন্সির নকশাল রাজনীতির নানা উপধারার মিলনমঞ্চ সেটি। সেযুগে হিন্দুত্ববাদ দেখা যেত না, বিজেপিটিজেপি বাংলায় ছিল না, শত্রুপক্ষ বলতে কংগ্রেস আর সিপিএম। শোধনবাদী বলে সিপিএমের বিরোধিতাই বেশী হত। কংগ্রেস এত কম ছিল যে চোখেই পড়ত না। শিবদা (শিবরত গুণ, আমাদেরই বিভাগের দাদা, বিভাগীয় প্রধান অতীন বাবুর পুত্র, অনুমান তার বয়স তখন একুশ) ক্যান্টিনের এক কোণায় ধরে নিয়ে গিয়ে বিড়ি অফার করে ট্রটস্কি নিয়ে খুব উত্তেজিত কথাবার্তা বলতে শুরু করল। শিবদার ওই বয়সেই রাজনৈতিক ও সাহিত্যের পড়াশোনা অপরিসীম ছিল – একবার স্যারের বাড়ি গিয়ে দেখি বিছানায় শুয়ে শুয়ে সলঝোনেংসিনের গুলাগ আরকিপেলাগো পড়ছে মন দিয়ে। সুমিতদা (চৌধুরী) এল একটু পরে, বললো, ‘বাবাকে বোলো, উনি তো সংস্কৃতি কমিটির প্রধান অধ্যাপক, আমরা আন্দোলন করব।’ ওই প্রথম জানলাম রাজনীতির অঙ্গনে পিতার বিরুদ্ধেও দাঁড়ানো যায়, যদি তা প্রগতির স্বপক্ষে যায়। সুমিতদা বলল ‘আমাদের স্টাডি সার্কেলে এসো, আমাদের অনেক পড়তে হবে, ডাস ক্যাপিটাল পড়ে?’ এ বি এস এ-এর অসিত দা তো কফি হাউসে রীতিমতো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ডাকলো একদিন, কালো ডায়েরিতে এন্ট্রি করে নিল আমার নাম আর সময়, পাশে দেখি স্প্যানিশ ভাষায় কিছু বাক্য লেখা রয়েছে। জিজ্ঞেস করে

জিজ্ঞাসার এই সংখ্যায় তোমার ল্যাখাটা পড়েছি।
ভাল লেগেছে বলেই ফের ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে ফিরে
আবার প্রফে মনোনিবেশ করলেন। প্রফ মাথায়
ঢোকেনি, কিন্তু স্যারের ওই ঘুরে দাঁড়ানোটা, ওই
স্বীকৃতিটুকু, কোনোদিন ভুলবো না।

জানলাম মূল ভাষায় স্প্যানিশ রাজনৈতিক টেক্সট পড়বে বলে স্প্যানিশ
শিখছে অসিতদা। কারো বিষয় রাশিবিজ্ঞান, কারো রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কারো
অঙ্ক। কিন্তু সবারই দেখলাম বিষয়ের বাইরে অগাধ চলাচল।

আস্তে আস্তে আলাপ হল নীরব, লাজুক, খানিক আড়ালে চলা কবি আর
গদ্যকারদের সঙ্গে। তাদের আবার কারো বিষয় বাংলা, কারো ইতিহাস,
কারো রাষ্ট্রবিজ্ঞান। তাদের নিয়ে সাহিত্যের আড্ডার দল গড়লাম।
সন্ধ্যার পরেও সেই আড্ডা কলেজের প্রাঙ্গণ ছাড়িয়ে কলেজ স্ট্রিট কফি
হাউজ, বা কখনো রাণাঘাট বা শ্রীরামপুরের দিকে রওনা হতো। নিজে
দের কবিতা পড়ছি, একে অপরকে শোনাচ্ছি, আর বিতর্কের গোলযোগে
ফেটে পড়ছে ক্যান্টিন, এ আমাদের নিত্য অভিজ্ঞতার সুখস্মৃতি।

‘জেথ্রো টাল শুনেছিস? ভালো জ্যাজ বা ব্লুজ?’ কলেজ ভরা ট্যাশ
নয়, এই প্রশ্ন যার কাছ থেকে এলো, সেই সমীর রায় (গুপীদা) সুদূর
মফস্বলের বাণীপুরের বাসিন্দা, সেখানে যে টাল এর বাঁশি-সহকারে
গাওয়া আন্ডার রায়স (১৯৮৪) এর গান পৌঁছেবে সেটাই জানতাম
না। এর পরে গুপীদার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ার পর সে আমার বাড়িতে
আসতো গ্রামের আরেকজন দাদা কে নিয়ে। আমরা শুনতাম ওঁদের কণ্ঠ
করে যোগাড় করা জ্যাজ আর ব্লুজ এর ক্যাসেট-লুই আর্মস্ট্রং, জন
হেন্ড্রিক্স, জো উইলিয়ামস, বিলি এক্সটাইন, মাডি ওয়াটার্স, বিবি কিং,
বাডি গাই, ইত্যাদি। অনেক পরে যখন শিকাগো গেছি প্রথমবার, বছর
কুড়ি আগে, তখন প্রথমেই খোঁজ নিয়ে বের করেছিলাম বাডি গাই এর
নামে তৈরি ব্লুজ বার-এর। ফিজিক্সের ছাত্র গুপীদার সঙ্গে প্রেসিডেন্সির
ক্যান্টিনে আলাপ না হলে যার নামগান শোনা হতো না! বিষয়ের বাইরে
নিয়ে যাওয়ার জন্য এই বিশ্বমন্ডল কলেজ ক্যান্টিন আমাদের অনেকের
কাছেই তাই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজে রাশিবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে ক্লাসে
পড়বার সময় প্রশ্ন করে করে পড়াতেন একমাত্র ডঃ বিশ্বনাথ দাশ,
যাকে বলা হয় সেক্রেটিক পদ্ধতি। ছাত্রদের প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নিজে
দেরকেই ঠিক উত্তরের দিকে যুক্তি ধরে ধরে এগিয়ে যেতে দেয়া।
তাতে তাদের শেখা সম্পূর্ণ হয়, বিষয়টি যথার্থ ভাবে আয়ত্ত হয়।
আমেরিকায় টানা লেকচার দিলেই ছেলেমেয়েরা বেনামি ফিডব্যাকে
অধ্যাপকদের গুপ্তির তুষ্টি করে দেয়, নোট দেখে (বা না দেখে) বোর্ডে
টুকে গেলে চাকরি থাকার আশা নেই। বাবা জানিয়েছিলেন বিশ্বনাথ বাবু
ছোটগল্পকার, গল্পগুচ্ছ বলে একটি ছোট পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর

অন্যতম। বালিতে থাকতেন, সম্প্রতি কলেজে প্রাক্তনীদেব মিটিং-এ
দেখা হবার পর জানলাম তিনি সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানে নিষ্ঠার সঙ্গে
তাঁর অবসরপ্রাপ্ত জীবন সপ্টে দিয়েছেন।

বিভাগীয় প্রধান অতীন্দ্রমোহন গুণ কে আমি দুবছর পেয়েছি, তাঁর
প্রতি আমার অন্যান্য কারণেও খুব আগ্রহ ছিল। সেগুলি কোনোটিই
বিষয়ের কারণে নয়, বিষয়ের বাইরের কারণে। প্রথমত তিনি আমাদের
প্রিয় বাংলাদেশের কবি নির্মলেন্দু গুণ এর সম্পর্কে দাদা। দ্বিতীয়ত
তিনি মনীষী শিবনারায়ণ রায়ের ব্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট গোষ্ঠীর সঙ্গে
যুক্ত এবং শিবনারায়ণ রায় সম্পাদিত জিজ্ঞাসা পত্রিকার একজন
সদস্য। অতীনবাবুর ভায়রা ভাই স্বয়ং আবু সৈয়দ আইয়ুব। এর ওপর
আবার আমাদের ক্যান্টিন রাজনীতি বিশারদ শিবুদা (শিবরত গুণ)
এর বাবা, সুতরাং নানা দিক থেকে তাঁর প্রতি আমাদের আগ্রহ।
জিজ্ঞাসার শিবনারায়ণবাবু তরুণদের কবিতা খুব যত্ন করে ছাপতেন।
সেসময়ে আমি দেশ ও জিজ্ঞাসায় নিয়মিত কবিতা দিতাম, ছাপাও
হত। অতীনবাবু একদিন মাল্টিভারিয়েটের একটা প্রফ বোর্ডে
লিখতে লিখতে হঠাৎ আমাদের দিকে ফিরে তাঁর সেই অননুক্রমণীয়
ময়মনসিংহের প্রস্থের বললেন, ‘জিজ্ঞাসার এই সংখ্যায় তোমার ল্যাখাটা
পড়েছি। ভাল লেগেছে’ বলেই ফের ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে ফিরে আবার
প্রফে মনোনিবেশ করলেন। প্রফ মাথায় ঢোকেনি, কিন্তু স্যারের ওই
ঘুরে দাঁড়ানোটা, ওই স্বীকৃতিটুকু, কোনোদিন ভুলবো না।

বিষয়ের বাইরে মন নিয়ে যাওয়ার উপকরণ আমাদের রাশিবিজ্ঞান
বিভাগে কিছু কম ছিলনা। ফলিত রাশিবিজ্ঞান পড়াতেন দীপঙ্কর বসু,
একদিন কথায় কথায় জানালেন উনি স্বয়ং রাজশেখর বসুর নাতি।
বাস আর যান কোথা! আমরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তাঁকে জর্জরিত
করে তুললাম। উনি আমাকে বললেন, ‘বিষয় নিয়ে তো কোনোই প্রশ্ন
কোনোদিন করো না, ডিপার্টমেন্টেও আসো না তুমি, এলে লোকজন
হাততালি দিয়ে অভিবাদন জানায়, এমনই তোমার ক্যান্টিনপ্রীতির
সুখ্যাতি, এদিকে বিষয়ের বাইরে গেলেই দেখি অনেক প্রশ্ন!’ আমি
বললাম, ‘বিষয় তো এগুলিই স্যার!’ পাকামোর তো শেষ ছিলনা।

অসীমশঙ্কর নাগ, ক্লাসে আমি আর স্বর্ণেন্দু ক্রমাগত গল্প করে চলেছি
দেখে আমাকে শুনিতে স্বর্ণেন্দুকে বললেন, ‘স্ট্যাটিস্টিক্স এর রেজাল্টে
কোনো ম্যাজিক হয় না, বুঝেছ?’ ওই তো সামান্য শব্দ। ম্যাজিক হয়
না। কিন্তু তার ভিতরে এমন এক মর্মভেদী ভরসনা ছিল, এমন একটা
সত্যের চাবুক ছিলো, যে আজও এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও আমার
ছাত্রদের এই কথা বলতে ইচ্ছে করে, বকুনি না হলেও, ম্লেহের সঙ্গে।
পরবর্তীকালে ম্যালকম গ্ল্যাডওয়েলের সোজা করে লেখা নানা মনস্তাত্ত্বিক
গবেষণার জনপ্রিয় সারসংক্ষেপ ‘আউটলাইন্স’ পড়ে জেনেছি যে
জীবনে ভালো কোনো কিছু ম্যাজিকের মত হয় না। অসাধারণ পরিশ্রম
ও সময় দিতে হয়। জিনিয়াস বলে কিছু নেই। প্রতিটি জিনিয়াস এক
মহৎ সাধনার অব্যর্থ ফল। ক্লাস করতাম না, খাতায় সই দরকার
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য, তাঁর বাড়িতে গেছি কলেজ স্ট্রিটের
কাছেই। নীরবে পাতার পর পাতা সই করে দিলেন। একবার মৃদুস্বরে
বললেন, ‘কিছুই শিখলে না!’

পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির স্টেট কলেজ শহরে ইউনিভার্সিটি পার্ক ক্যাম্পাসে থাকাকালীন রাশিবিজ্ঞানের স্বনামধন্য পণ্ডিত সি আর রাও এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার কথা আগেই বলেছি, তখন তাঁর বয়স পাঁচত্তর হবে। প্রোফেসর এমেরিটাস পদে তখন বৃত্ত তিনি, আর তাঁর কন্যা তেজস্বিনী (‘তেজা’) আমাদের বাফেলোর বন্ধু (১৯৯০-৯২ সালে আমি স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ ন্যুয়র্ক এর বাফেলো শহর ক্যাম্পাসে স্ট্যাটিস্টিক্সে মাস্টার্স করেছিলাম)। তেজা নৃত্যপাটিয়সী, আমাদের সঙ্গীতপ্রিয়তার কারণে সখ্য ছিল। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে প্রশিক্ষণ পাওয়ার কারণে তেজার সঙ্গে নানা অনুষ্ঠানে তবলায় সঙ্গত করেছি, তার বাড়ির সুক্ষ জালিক স্পিকার সিস্টেমে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে রবিশঙ্কর আলি আকবর, বালমুরলীকৃষ্ণ, সুবালম্বী, জাকির হুসেন, সেমনগুডি শ্রীনিবাস আইয়ার, ভীমসেনজির খেয়াল, হরিজির বাঁশি, শিবজির সন্তুর শোনার স্মৃতি। পি এইচ ডি করার সময় বাফেলো ছাড়তে হলো, আমাদের মন খারাপ। তেজা বললেন, ‘যাচ্ছো তো আমার বাবার শহরে, মাসে মাসে বাবা মা কে ড্রাইভ করে এখানে নিয়ে এসো, ওঁদের বয়স হয়েছে, এখন অতটা রাস্তা (৩২০ কিমি) গাড়ি চালাতে চান না।’ শুনে তো আমার চক্ষুস্থির। সি আর রাও এর সঙ্গে অতটা সময় কাটাতে পারব?

অধ্যাপক রাও এর সঙ্গে অনেক বছরের নানা স্মৃতি। তবে তাঁর সঙ্গে বিষয়ের বাইরে গিয়ে গিয়ে মূল বিষয় নিয়ে বলা হয়ে উঠছিল না। শেষমেষ মূল বিষয় নিয়ে একদিন রাওকে প্রশ্ন করেই ফেললাম, ‘তাকে আর তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ঘোর তুষারপাতের মধ্যে বাফেলোর দিকে গাড়ি চালিয়ে আসতে আসতে। যাঁরা শ্রী রাও কে দেখেছেন, তাঁরা জানেন, তিনি কি শিশুর মতো সরল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘স্যার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাশিবিজ্ঞান বিভাগের আন্ডারগ্রাজুয়েট সিলেবাস কে তৈরি করেছিলেন?’ উনি পালটা প্রশ্ন করলেন মৃদু হেসে, ‘কেন বলোতো?’ আমি বললাম, ‘স্যার, পি এইচ ডি শেষ হয়ে এল, পেপারও বেরোবে কয়েকটা, কিন্তু আমি আজকেও বি এস সি-র প্রফ গুলি বুঝতে পারিনি, মনেও করতে পারিনা। এরকম সিলেবাস, যেখানে আমাদের বিষয়টি খতিয়ে বোঝার কোনো দরজা পর্যন্ত খোলা নেই, অমন নির্মম, নিষ্ঠুর, কঠিন সিলেবাস কে বা কারা করেছিলেন, জানতে ইচ্ছে করে।’

দেবদুর্লভ সেই অপরাধী হাসিভরা মুখটি কোনোদিনও ভুলবো না। মৃদুস্বরে আনমনাসুরে স্মৃতিচয়ন করতে করতে উনি বললেন, ‘দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে তখন। মহলানবিশ ফিজিক্সের অধ্যাপক, কিন্তু মন পড়ে আছে ওয়াল্ট আর উইলফোর্ডহিটজের অসাধারণ সব যুদ্ধকালীন রাশিবিজ্ঞানের আবিষ্কারের উপর। যুদ্ধ নয়, যুদ্ধের বিচার করতে গিয়ে অসাধারণ সব অঙ্ক করে ফেলেছেন তাঁরা। (জরডান এলেনবার্গের বই How not to be Wrong - The Power of Mathematical Thinking - এ এর বিস্তারিত রোমহর্ষক বিবরণ আছে)। রাশিবিজ্ঞান তখন নবীন, জায়মান একটি বিষয়, কী কী পড়াতে হবে সেটাই ঠিক

কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও বদলায়নি। সেই একই নোট সবাই বোর্ডের বাঁদিকের উত্তর পশ্চিম কোণ থেকে ডানদিকের দক্ষিণপূর্ব কোণ অবধি টুকে চলেছেন। ছাত্ররা বুঝলো কি বুঝলো না, কারো খেয়াল নেই। কোর্সগুলির লেভেলিং হয়নি।

হয়নি। আমাকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মহলানবিশ বললেন, যা যা রেজাল্ট আর প্রফ পাওয়া যাচ্ছে সব নথিবদ্ধ করে সিলেবাসে দিয়ে দাও। পরে আস্তে আস্তে ঠিকঠাক করা হবে। পরে আর ঠিক করা হয়নি। আমরা ধরে নিয়েছিলাম নবীন শিক্ষকেরা আসবেন, তাঁরা সিলেবাস বয়স ও স্তর অনুযায়ী পরিবর্তন করে নেবেন।’

‘যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থায় যেমন ১০০ লেভেল মানে আন্ডারগ্রাজুয়েট মাইনর স্তরের ক্লাস, সেখানে নানা রকম গল্প ও ছবি দিয়ে স্ট্যাটিস্টিক্স কী, সেটা ভালো করে বোঝানো হবে। দুয়েকটা প্র্যাকটিকাল অঙ্ক থাকবে, কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করাই এর উদ্দেশ্য। ২০০, ৩০০ বা ৪০০ লেভেল এর কোর্স হল আন্ডারগ্রাজুয়েট স্তরের মেজর (অনার্স) কোর্স, সেখানেও আবার ২০০ লেভেল এর একই কোর্স ৩০০ বা ৪০০ লেভেলেও নেয়া যায়, আরো গভীরে গিয়ে সেখানে নানা রেজাল্ট ও প্রফ শেখানো হয়। কিন্তু ১০০ লেভেলের কোর্সগুলি নেয়া থাকলে মূল বিষয়টা সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা থাকে, তাই তখন আর বুঝতে অসুবিধে হয় না। মাস্টার্স আর পি এইচ ডি লেভেলে গিয়ে ৫০০, ৬০০ বা ৭০০ লেভেলে ওই বিষয়গুলিই আরো অনেক গভীরে গিয়ে শেখা যায়, গবেষণা করার রাস্তা খোঁজা যায়। প্রতিনিয়ত এই সিলেবাসের ক্রমাগত উন্নতি ঘটে চলেছে, ছাত্রদের ফিডব্যাকে সেগুলি রদবদল করা হচ্ছে। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস স্বাধীনতার ৪০ বছর পরেও বদলায়নি। সেই একই নোট সবাই বোর্ডের বাঁদিকের উত্তর পশ্চিম কোণ থেকে ডানদিকের দক্ষিণপূর্ব কোণ অবধি টুকে চলেছেন। ছাত্ররা বুঝলো কি বুঝলো না, কারো খেয়াল নেই। কোর্সগুলির লেভেলিং হয়নি।’

এতক্ষণে ... অরিন্দম কহিলা বিষাদে...

এ বছর শ্রী রাওয়ের ৯৬ বছর পূর্তি। তাঁকে প্রণাম। প্রণাম আমার প্রেসিডেন্সির শিক্ষকদের প্রতিও - বিশেষ করে অতীন্দ্রমোহন গুণ, বিশ্বনাথ দাস, দীপংকর বসু, অসীমশঙ্কর নাগ, শৈবাল চট্টোপাধ্যায়কে, যাঁরা আমার বিষয়বিমুখতাকে বিষয়ের দিকে ফিরিয়ে আনার স্নেহপূর্ণ চেষ্টা করে গিয়েছিলেন নিরন্তর।

